নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

(২৩)

শরৎচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর

উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে, নবজাগরণের পার্থিব মানবতাবাদী চিন্তাকে হাতিয়ার করে, বিদ্যাসাগর এক সুমহান এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজ-সভ্যতার যথার্থ অগ্রগতির স্বার্থে তিনি চেয়েছিলেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, জ্ঞানে-চরিত্রে-মূল্যবোধে বড় হোক, অন্যের দুঃখ-বেদনায় পরমাত্মীয় হোক। বিদ্যাসাগর নিজের জীবন ও কর্ম দিয়ে স্বয়ং সেই অপার মনুষ্যত্বের বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক এই চিন্তা-চেতনাকে, মনুষ্যত্বের সাধনাকে বিশেষত নারীমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে রসোত্তীর্ণ ভাবে বহন করেছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনন্যসাধারণ কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে। বিদ্যাসাগরের কাঙ্ক্ষিত চরিত্রকে সাহিত্যে রূপ দিয়ে সমাজ-অভ্যন্তরে উন্নততর হৃদয়বৃত্তির এক উজ্জ্বল দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। এই কারণেই এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষ শরৎসাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সৃষ্ট কয়েকটি চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "গোকুল, যাদব, গিরীশের দলই বিকাশের পথে কমিউনিস্ট হয়। নারীদের মধ্যে বিন্দু, নারায়ণী, হেমাঙ্গিনী, 'নিষ্কৃতি'র ছোট-বৌ, বড়-বৌ— এই জাতের নারীরাই সুযোগ পেলে বিকাশের পথে সত্যিকারের কমিউনিস্ট হতে পারে।"

শরৎচন্দ্রের প্রবল আক্ষেপ ছিল যে, বিদ্যাসাগরের মহান কর্মকাণ্ডের পক্ষে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসেননি তাঁর সমকালীন তেমন কোনও সাহিত্যিক। খুব দুঃখ করে তিনি বলেছেন, "স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন গভর্নমেন্টের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন, তখন তিনি কেবল শাস্ত্রীয় বিচারই করেছিলেন, হিন্দুর মনের বিচার করেননি। তাই আইন পাশ হল বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারলে না। তাঁর অতবড় চেষ্টা নিষ্ফল হয়ে গেল। নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন তাঁকে অনেক সইতে হয়েছিল, কিন্তু তখনকার দিনের কোন সাহিত্যসেবীই তাঁর পক্ষ অবলম্বন করলেন না। হয়ত, এই অভিনব ভাবের সঙ্গে তাঁদের সত্যই সহানুভূতি ছিল না, হয়ত, তাঁদের সামাজিক অপ্রিয়তার অত্যন্ত ভয় ছিল, যে জন্যই হউক, সেদিনের সে ভাবধারা সেইখানেই রুদ্ধ হয়ে রইল— সমাজদেহের স্তরে স্তরে, গৃহস্থের অন্তঃপুরে সঞ্চারিত হতে পেলে না। কিন্তু এমন যদি না হত, এমন উদাসীন হয়ে যদি তাঁরা না থাকতেন, নিন্দা, গ্লানি, নির্যাতন— সকলই তাঁহাদিগকে সইতে হত সত্য, কিন্তু আজ হয়ত আমরা হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থার আর একটা চেহারা দেখতে পেতাম। সে দিনের হিন্দুর চক্ষে যে সৌন্দর্য-সৃষ্টি কদর্য, নিষ্ঠুর ও মিথ্যা প্রতিভাত হত, আজ অর্ধশতাব্দী পরে তারই রূপে হয়ত আমাদের নয়ন ও মন মুগ্ধ হয়ে যেত।" (সূত্র : সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)।

শরৎচন্দ্রের এই বুকভাঙা আক্ষেপ থেকে বোঝা যায়, বিদ্যাসাগরের হৃদয়ের বেদনাকে, সেই বেদনাবোধ থেকে সৃষ্ট তাঁর অবিচল কর্তব্যনিষ্ঠাকে তিনি কী গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সত্যিকারের বড় মানুষ বলতে তিনি বিদ্যাসাগরের মতো মানুষদেরই বুঝতেন। আবার, শরৎচন্দ্রের এই উপলব্ধি উপর-উপর ছিল না। ছিল না বলেই তাঁর 'পণ্ডিতমশাই' উপন্যাসে আমরা পাই, গ্রামের মধ্যে একটি ছোট্ট পাঠশালা সম্পর্কে বৃন্দাবন ও কেশবের মধ্যে আলোচনায় কেশব বলছে ঃ "কিন্তু তোমার আমার সামর্থ্য কতটুকু? এই ছোট্ট একটুখানি পাঠশালায় জনকতক ছাত্রকে পড়িয়ে কতটুকু প্রায়শ্চিত্ত হবে?" বৃন্দাবন বিস্মিতভাবে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "কথাটা ঠিক হল না ভাই। আমার পাঠশালার একটি ছাত্রও যদি মানুষের মত মানুষ হয়, তো এই ত্রিশ কোটি লোক উদ্ধার হয়ে যেতে পারে। নিউটন, ফ্যারাডে, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি হয় না কেশব। বরং আশীর্বাদ কর যেন এই ছোট পাঠশালার একটি ছাত্রকেও মরণের পূর্বে মানুষ দেখে মরতে পারি।"

মান্ধাতা আমলের কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে তথাকথিত শাস্ত্রবাদীরা মানুষকে নিপীড়ন করছে দেখে 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দ্বিতীয় পুস্তক)-এ বিদ্যাসাগর লিখেছেন, "ধন্যরে দেশাচার! তোর কী অনির্বচনীয় মহিমা! ...তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া ...হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায়-অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।" বিদ্যাসাগরের এই পথ ধরেই, তাকে আরও স্পষ্ট করে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "কোন একটা বিশেষ নিয়ম যখন দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহা যে একদিনেই হইয়া যায় তাহা নহে, ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইতে থাকে। যাঁহারা সম্পন্ন করেন, তাঁহারা পুরুষের অধিকার লইয়া করেন। তখন তাঁহারা পুরুষ— পিতা নন, ভ্রাতা নন, স্বামী নন। যাঁহাদের সম্বন্ধে নিয়ম করা হয়, তাঁহারাও আত্মীয়া নহে, নারীমাত্র। পুরুষ তখন পিতা হইয়া কন্যার দুঃখের কথা ভাবে না। সে তখন পুরুষ হইয়া পুরুষের কল্যাণ চিন্তা করে— নারীর নিকট হইতে কতখানি কিভাবে আদায় করিয়া লইবে, সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। তারপর মনু আসেন, পরাশর আসেন, মোজেস আসেন, পল আসেন, শ্লোক বাঁধেন, শাস্ত্র তৈয়ার করেন— স্বার্থ তখন ধর্ম হইয়া সুদৃঢ় হস্তে সমাজ-শাসন করিবার অধিকার লাভ করে।" (সূত্র : নারীর মূল্য)।

ওই পুস্তকে বিদ্যাসাগর বাল্যবিধবাদের সীমাহীন দুর্দশার কথা লিখেছেন। বুকের রক্ত নিংড়ানো সেই লেখা পড়লে আজও তাঁর হৃদয়ের যন্ত্রণা শোনা যায়। সেখানে আছে নিষ্ঠুর সমাজের প্রতি বিদ্যাসাগরের করুণাঘন আর্তি— "হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! ...হতভাগ্য বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। ...কী আশ্চর্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহে। ...হায়, কী পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।" —বিদ্যাসাগরের এই যন্ত্রণা যথার্থ ভাবে বহন করেছেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। সমাজের মধ্যে বিধবা নারীর উপর সংঘটিত চরম অবমাননা দেখে কাতরভাবে তিনি লিখেছেন, "সে নিরাভরণা, সে একবেলা খায়, সে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটে, থান-কাপড় পরে, কেন না সে দেবী! চীৎকার করিয়া পুরুষ প্রচার করিতে লাগিল আমাদের বিধবার মত কাহার সমাজে এমন দেবী আছে! অথচ দেবীটিকে বিবাহের ছাঁদনা তলায় ঢুকিতে দেওয়া হয় না— পাছে দেবীর মুখ দেখিলেও আর কেহ দেবী হইয়া পড়ে। মঙ্গল-উৎসবে দেবীর ডাক পড়ে না, দেবীর ডাক পড়ে শ্রাদ্ধের পিণ্ড রাঁধিতে!" (সূত্র : নারীর মূল্য)।

অনতিকাল পরেই বিধবা হবে— এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনেও রক্ষণশীল সমাজের রক্তচক্ষুর চাপে নিতান্ত বৃদ্ধের সঙ্গে হলেও শিশুকন্যাদের বিবাহ দিয়ে বাকি সারাটা জীবন সেই বিধবাদের উপর যারা নিপীড়ন চালায় তাদের কখনও ক্ষমা করেননি বিদ্যাসাগর, করেননি শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের লেখার ছত্রে-ছত্রে তাই দেখা দিয়েছে নারীর উপর অবদমনের চিত্র, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ধিক্কার। 'পথনির্দেশ' গল্পে হেম-এর মা'র সংলাপে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, "কি জানি কোন পাষাণ বিধবার সাজ তৈরি করে গিয়েছিল।" নিপীড়িত নারীর অভিমানকে শরৎচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন ব্যঞ্জনাময় ধিক্কারে। শরৎচন্দ্র এরকম অসংখ্য নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কোথাও এতটুকু উগ্রতা প্রকাশ করেননি। এইটিই তাঁর শৈলী, শৈলীর অনন্যতা এবং অবশ্যই স্মরণীয়, বিদ্যাসাগরের ধারাবাহিকতাতেই এই অনুপম শৈলীর অভ্যুদয়।

নৈতিক দিক থেকেও শরৎচন্দ্রকে বিদ্যাসাগরের অনুসারী বলতে হয়। রক্ষণশীল সমাজ এবং তার ভয়ে কুণ্ঠিত লোকজনকে বিদ্যাসাগর বলতেন, "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।" (সূত্র : ভাই শম্ভু চন্দ্রকে লেখা চিঠি)। আর, শরৎচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন, "নারীর উপর পুরুষের কাল্পনিক অধিকারের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিলে কি অনিষ্ট ঘটে, তাহা নিজের কথায় ও পরের কথায় বলিবার চেষ্টা করিয়াছি— এই মাত্র। তাহাতে শাস্ত্রের অসম্মান করা হইয়াছে, কি হয় নাই, দেশাচারের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, কি হয় নাই— একথা মনে করিয়া কোথাও থামিয়া যাইতে পারি নাই। যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও।"

কেউ কেউ শরৎচন্দ্রকে প্রশ্ন করেছেন, 'বিদ্যাসাগর বাস্তবে বিধবার বিবাহ দিতে পেরেছেন। কিন্তু আপনি সাহিত্যে বিধবার বিয়ে দিতে পারলেন না কেন?' শরৎচন্দ্র বলেছেন, " 'পল্লীসমাজ' বলে আমার একখানা ছোট বই আছে। তার বিধবা রমা বাল্যবন্ধু রমেশকে ভালবেসেছিল বলে আমাকে অনেক তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সমালোচক এমন অভিযোগও করেছিলেন যে, এতবড় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিলে গ্রামে বিধবা আর কেউ থাকবে না। মরণ-বাঁচনের কথা বলা যায় না, প্রত্যেক স্বামীর পক্ষেই ইহা গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু আর একটা দিক্‌ও ত আছে। ইহার প্রশ্রয় দিলে ভাল হয় কি মন্দ হয়, হিন্দু-সমাজ স্বর্গে যায় কি রসাতলে যায়, এ মীমাংসার দায়িত্ব আমার উপরে নাই। রমার মত নারী ও রমেশের মত পুরুষ কোন কালে, কোন সমাজেই দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মগ্রহণ করে না। উভয়ের সম্মিলিত পবিত্র জীবনের মহিমা কল্পনা করা কঠিন নয়। কিন্তু হিন্দু-সমাজে এ সমাধানের স্থান ছিল না। তার পরিণাম হল এই যে, এতবড় দু'টি মহাপ্রাণ নর-নারী এ জীবনে বিফল, ব্যর্থ, পঙ্গু হয়ে গেল। মানবের রুদ্ধ হৃদয়দ্বারে বেদনার এই বার্তাটুকুই যদি পৌঁছে দিতে পেরে থাকি, ত তার বেশী আর কিছু করবার আমার নেই। এর লাভালাভ খতিয়ে দেখবার ভার সমাজের, সাহিত্যিকের নয়। রমার ব্যর্থ জীবনের মত এ রচনা বর্তমানে ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের বিচারশালায় নির্দোষীর এত বড় শাস্তি ভোগ একদিন কিছুতেই মঞ্জুর হবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় জানি। এ বিশ্বাস না থাকলে সাহিত্যসেবীর কলম সেইখানেই সে দিন বন্ধ হয়ে যেত।" (সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি)।

বিদ্যাসাগর নারীকে কারও অনুকম্পার পাত্রী করতে চাননি। তিনি সর্বদাই চেয়েছিলেন, ছেলেদের মতো মেয়েরাও আধুনিক শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে মানুষের মতো মানুষ হোক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন, কোনও সামাজিক অধিকার থেকে, এমনকি পৈতৃক সম্পত্তি থেকেও, নারীকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। নারীকে এই যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে গেলে সমাজ-মানসিকতায় বদল চাই, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে এটি কোনও ভাবেই সম্ভবপর নয়। এই কঠোর-কঠিন কাজই আজীবন করে গিয়েছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর ধারাবাহিকতাতে শরৎচন্দ্রও, বিশেষত নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সমাজ-মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য নিজের অমিত শক্তিশালী লেখনীকে প্রয়োগ করেছিলেন। সে-কারণেই তাঁর অভূতপূর্ব সৃষ্টি, বিখ্যাত 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে সাবিত্রী'র সংলাপে শরৎচন্দ্র এক অসাধারণ দার্শনিক কথা লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, "তুমি বলবে সত্য হোক মিথ্যা হোক আমি সমাজ চাইনে, তোমাকে চাই। কিন্তু আমি তো তা বলতে পারিনে। সমাজ আমাকে চায় না, আমাকে মানে না জানি। কিন্তু আমি তো সমাজ চাই, আমি তো তাকে মানি। আমি তো জানি, শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না।" বিদ্যাসাগরের চিন্তাকে প্রসারিত করে শরৎচন্দ্র তাঁর 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রবন্ধে বলেছেন, "মেয়েকে যে মানুষ বলে নেয়, কেবল মেয়ে বলে, দায় বলে, ভার বলে নেয় না, সেই কেবল এর দুঃখ বইতে পারে, অপরে পারে না।" (চলবে)

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

শিলিগুড়িতে এনআরসি বিরোধী মিছিল

ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টিকারী ও নাগরিকত্ব হরণকারী এনআরসি এবং সিএএ প্রতিরোধে এবং বিজেপি সরকারের পুলিশের গুলিতে নাগরিক হত্যার প্রতিবাদে ২৭ ডিসেম্বর এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে শিলিগুড়িতে এক ধিক্কার মিছিল সংঘটিত হয়। বাঘাযতীন পার্কে জমায়েতে বক্তারা সর্বত্র গণকমিটি গড়ে প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। দুই সহস্রাধিক মানুষের মিছিল বাঘাযতীন পার্ক থেকে শুরু হয়ে এয়ারভিউ মোড়ে শেষ হয়। নেতৃত্ব দেন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য যথাক্রমে কমরেডস গৌতম ভট্টাচার্য, তপন ভৌমিক, শিশির সরকার। ২০ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতেও মিছিল হয়।

২৭ ডিসেম্বর শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে তিন বছরের এক শিশুকন্যা শিকার হয় নারকীয় অত্যাচারের। এর প্রতিবাদে ২৯ ডিসেম্বর এআইডিএসও-এআইডিওয়াইও-এআইএমএসএসের নেতৃত্বে শিয়ালদহ রেল পুলিশ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

শ্রমিক ধর্মঘট সফল করার ডাক ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের

৮ জানুয়ারি ১২ দফা দাবিতে দশটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় ফেডারেশনগুলির ডাকা সারা ভারত ধর্মঘটে অংশগ্রহণের আবেদন জানিয়ে অল বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল ২৩ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, গোটা দেশের অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রের মতো ব্যাঙ্কিং শিল্পও আজ সমস্যায় জর্জরিত। দশটি ব্যাঙ্ককে মিশিয়ে দিয়ে ৪টিতে পরিণত করা হলে ভবিষ্যতে বেশ কিছু শাখা বন্ধ হয়ে যাবে এবং বাড়তি হয়ে যাওয়া হাজার হাজার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হবেন। এ ছাড়াও বেসরকারিকরণ, বিপুল পরিমাণ অনুৎপাদক সম্পদ, কর্মী নিয়োগ না করা, এফআরডিআই বিল-২০১৭ পুনরায় চালু করার আশঙ্কা ইত্যাদি ব্যাঙ্কশিল্প ও ব্যাঙ্ককর্মীদের সামনে সমস্যা হিসাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি ব্যাঙ্ককর্মীদের ৮ জানুয়ারি সারা ভারত ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

এ আই ইউ টি ইউ সি-র কেরালা রাজ্য সম্মেলন

২৭ ডিসেম্বর কেরালার তিরুবনন্তপুরমে এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্মেলন উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সভাপতি আর কুমার, প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেডস ভি কে সদানন্দন, আর সোমশেখর, অনাভরথন, শাইলা কে জন। ২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন থেকে শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করার এবং ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

ভাষা সমস্যা সমাধানে এসইউসিআই(সি)-র বক্তব্যকে মান্যতা দিতে বাধ্য হল আসাম সরকার

আসামের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯, আসাম রাজ্য সরকার কিছু নীতিগত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সে সম্পর্কে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আসাম রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ২৫ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

আসামের সকল শ্রেণির জনসাধারণ অবগত আছেন যে, নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি অটুট এবং অক্ষুণ্ণ রাখার প্রশ্নে অসমীয়াভাষী জনসাধারণের যে গভীর আবেগ ও অনুভূতি রয়েছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের দল গত ১৯৭৯ সালের আসাম আন্দোলনের দিন থেকেই দাবি করে আসছে যে রাজ্যের জনবিন্যাস এবং জনসংখ্যার প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে এবং রাজ্যের ছোটবড় ভাষিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মাতৃভাষা চর্চা করার ক্ষেত্রে সংবিধান প্রদত্ত অধিকার অক্ষুণ্ণ রেখে— রাজ্য ভাষা হিসাবে অসমীয়া ভাষার বর্তমান মর্যাদা স্থায়ী করার জন্য ভারতের পার্লামেন্টে সংবিধান সংশোধন অথবা বিশেষ আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হোক। আমরা লক্ষ করেছি অসমীয়াভাষী জনসাধারণসহ অপরাপর সকল অংশের জনগণ প্রথম থেকেই আমাদের বহুল প্রচারিত এই প্রস্তাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। আমরা আনন্দিত যে আসামের সকল জনগণ কর্তৃক সমাদৃত এই দাবির যৌক্তিকতা বিলম্বে হলেও আসাম সরকার ২১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মন্ত্রীসভার বৈঠকে মেনে নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুধু প্রস্তাব গ্রহণ নয়, আমরা দাবি করছি এই ন্যায্য দাবি যাতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার অবিলম্বে মেনে নিয়ে দ্রুত বাস্তবায়িত করে, তা সুনিশ্চিত করার জন্য আসাম সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর যথোচিত চাপ সৃষ্টি করুক।

এই ঘোষণায় রাজ্য সরকার অসমীয়া ভাষার বিস্তারের কথা বলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় স্কুল পর্যায়ে অসমীয়া ভাষা বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় করার যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে, সেই প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বসবাসকারী সকল অ-অসমীয়া জনগণই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে, নিজ নিজ প্রয়োজনে অসমীয়া ভাষার চর্চা করেন এবং স্বচ্ছন্দে এই ভাষায় কথা বলেন, মত বিনিময় করেন, ভাব বিনিময় করেন এবং জোর জবরদস্তি না করলে আরও বেশি করে করবেন। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল— স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে যেখানেই ভাষাচর্চার জন্য জোরজবরদস্তি করার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই সকল জনগণের পারস্পরিক সম্প্রীতি— যা স্বেচ্ছায় মাতৃভাষার বাইরে অপর একটি ভাষা শিখবার মূল ভিত্তি— সেটাই বিপন্ন হয়েছে। অতীতে আসামেও তাই হয়েছে। এটাও স্মরণযোগ্য যে অতীতে জোর করে গোটা দেশে হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। আবার এই নীতি প্রত্যাহৃত হওয়ার পর দেশের মানুষ আজ নিজ নিজ প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় হিন্দি ভাষা চর্চা করছেন। ভাষা চর্চার এটাই অমোঘ নিয়ম। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মহান নেতা লেনিনও এই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, এইভাবে অসমীয়া ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার কোনও প্রয়োজন নেই। মানুষ স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই অসমীয়া ভাষা শিখবেন, চর্চা করবেন।

আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছি যে, উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও আসাম সরকার আরও বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত একই সাথে ঘোষণা করেছে। আমাদের দৃঢ় অভিমত হচ্ছে, রাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। নচেৎ জনগণের ঐক্য মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। তাই আমাদের দাবি এই পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচিত হোক।

একই সঙ্গে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আমরা লক্ষ করলাম যে, অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত দাবিদাওয়ার সঙ্গে রাজ্যের চূড়ান্ত অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, অসহনীয় বেকার সমস্যা যা রাজ্যের জনসাধারণের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, তা মোকাবিলা করার অপরিহার্য প্রয়োজনে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রাজ্যে ছোট, মাঝারি এবং সুনির্দিষ্ট বড় কলকারখানা গড়ে তোলার জরুরি প্রশ্নে আসাম সরকারের এই ঘোষণায় একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তাই আমাদের দাবি আসাম সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে শিল্প স্থাপনের একটি বাস্তবানুগ প্যাকেজ প্রোগ্রাম অবিলম্বে ঘোষণা করুক।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com